মতি-মুচিনী ঃ

মতি-মুচিনীর মৃত্যুদ্বারা বিভূতিভূষণ 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন—'একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।' অতএব মতি-মুচিনী আলোচ্য উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট চরিত্র। কিন্তু এই বিশিষ্টতা শুধু মন্বন্তরে তার প্রথম মৃত্যু ঘটেছে বলে নয়, লেখক যেভাবে তার কার্যধারার মধ্যে দিয়ে স্তরে স্তরে তার চরিত্রের বিকাশ ও বিবর্তন দেখিয়েছেন, তাতেই এই বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মতিকে আমরা প্রথম দেখলুম ভাতছালা গ্রামে অনঙ্গ যখন তার ফেলে আসা ভিটেতে ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে গেছে। ভাতছালায় থাকাকালীন মতি-বাগ্‌দিনী, কালী-গোয়ালিনী, মতি-মুচিনী প্রভৃতি অনঙ্গর প্রতিবেশিনী ছিল। এরা সকলেই অনঙ্গকে দেখতে এলো। এরা যেমন অনঙ্গকে ভুলে যায়নি, অনঙ্গও তেমনি এদের সাহায্যের কথা ভোলেনি। ভাতছালায় থাকতে কতদিন অনঙ্গদের অনাহারে কেটেছে। এই মতি তখন কত পাকা আম কুড়িয়ে এনে দিয়েচে, লোকের গাছের পাকা কাঁঠাল কুড়িয়ে এনেচে। রাত্রিবেলা দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে এই সব গল্পই অনঙ্গ এদের সঙ্গে করতে লাগল। মতির সঙ্গে নাইতে গিয়ে কিভাবে গামছা দিয়ে অনঙ্গ শোলমাছ ধরেছিল, সে গল্পও হল। গল্প করতে করতে প্রায় সারা রাত্রিটাই কেটে গেল। ক'দিন আনন্দে কেটে যাবার পর অনঙ্গ চলে এল। আসবার দিন মতি কেঁদে আকুল। তার মনে হল, সেও অনঙ্গ-বৌয়ের সঙ্গে চলে আসবে। অন্যান্যদের মত সেও খানিকটা খেজুরের পাটালি খেজুরগাছের বাকলায় বেঁধে নিয়ে এল অনঙ্গর জন্য। অনঙ্গর জন্য মতির স্নেহ-মমতার যেন শেষ নেই।

এরপর মতিকে যখন অনঙ্গর নতুন গাঁয়ের বাড়িতে দেখা গেল, তখন না খেতে পেয়ে তার রোগা জীর্ণশীর্ণ চেহারা। দেশে মন্বন্তর শুরু হয়ে গেছে। অনঙ্গর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল—'সাতদিন ভাত খাইনি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি-গুগলি। তাও এদানি মেলে না।' সে আরও জানাল, অনঙ্গর সাধের পদ্মবিলের জল লোকে গুলিয়ে গুলিয়ে একেবারে ঘোলা করে দিয়েছে। বাচ্চারা পেটের জ্বালায় কাঁদচে ; তাদের মায়েরা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তাদের মুখে দিয়ে কান্না থামাচ্চে। এর ফলে নেড়ু বুনোর ছোট মেয়েটা পেটের অসুখে মরে গেল। সে আরও জানাল, অত বড় মুচিপাড়াটা একেবারে ভেঙে গেছে, লোক সব কে কোথায় চলে গেছে। মতি কাঁদছিল। অনঙ্গ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তাকে গুড় ভাত খেতে দেবে।

আর একদিন মতি এল; তার জীর্ণশীর্ণ চেহারা, 'পরনে উলি-দুলি ছেঁড়া কাপড়, মাথার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়চে।' অনঙ্গ সেদিন মতিকে দিল মিঠে কুমড়ো সেদ্ধ আর লাউশাক চচ্চড়ি। মতি দুটো ভাত চাইলো কিন্তু অনঙ্গ দুঃখের সঙ্গে জানাল, ভাত নেই। যা ছিল তাই যত্ন করে খেতে দিয়ে অনঙ্গ বললে—'আর কি নিবি মতি?' এত দুঃখের মধ্যেও মতি রসিকতা করে বললে—'মাছ দাও, মুগির ডাল দাও, বড়িচচ্চড়ি দাও—' বলা বাহুল্য, এ সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যেমন মতির রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আমরা বুঝতে পারি, যেসব খাদ্য সে ঠাট্টা করে চাইছে, এসব খাদ্যের সংস্থান একদিন তার ছিল, এগুলির সঙ্গে সে পরিচিত। মন্বন্তরে মানুষের অবস্থার কী করুণ পরিবর্তন!

মতির শক্তি ও সাহসের শেষ পরিচয় পাওয়া গেল জঙ্গলের মধ্যে মেটে আলু সংগ্রহের অভিযানে। শাবল নিয়ে কাপালী-বৌ আর অনঙ্গকে সঙ্গে করে সে বাঁওড়ের দুর্ভেদ্য কাঁটা জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো মাটি খুঁড়ে আলু তুলতে। প্রায় একঘণ্টা ধরে চলল সমবেত চেষ্টা। মতি-মুচিনী মাটি মেখে ভূত হল, কাপালী-বৌ লতার জঙ্গল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাত লাল করে ফেলল আর অনঙ্গ আনাড়ির মত সেই পাঁচ-ছয় সের ওজনের আলুর একধারটা ধরে ব্যর্থ টানাটানি করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত আলু উঠলো, কিন্তু দেখা দিল এক আকস্মিক বিপত্তি। একটা জোয়ান মত দাড়িওয়ালা লোক সেই বনের মধ্যে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মতি এগিয়ে এসে বললে—'তুমি কে গা? এদিকি মেয়েছেলে রয়েচে—এদিকি কেন আসচো?' লোকটা তবু এগিয়ে এলো অনঙ্গর দিকে। তার মতলব খারাপ। সে কাছে এসে খপ করে যেমন অনঙ্গ-বৌয়ের হাতটা ধরতে যাবে, অমনি মতি সজোরে তাকে মারলে এক ঠ্যালা। লোকটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল সেই আলুর গর্তে। তারপর বেগতিক বুঝে সে পালাল। এরপর সন্ধ্যার অন্ধকারে মতি একাই আলুটা বয়ে নিয়ে এলো সকলের সঙ্গে। বিপদের সময়ে হতোদ্যম না হয়ে এই কর্মপ্রচেষ্টা ও সাহস সত্যই প্রশংসনীয়। এছাড়া সে নির্লোভ। কারণ একদিন সে প্রতিদিনই আসতো অনঙ্গর বাড়ি কিছু খাবার প্রত্যাশায়। মেটে আলুর ভাগ পেয়ে সে আর কয়েকদিন এলো না।

শেষে একদিন দেখা গেল মতি হাবুদের বাড়ির সামনে একটা আমগাছতলায় শুয়ে আছে। তার হাত-পা ফুল্‌ছে, মুখ ফুল্‌ছে, হাতে একটা মাটির ভাঁড়। বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গাচরণ তাকে জিজ্ঞেস করল—কে, মতি? কি হয়েছে তোর?

মতি বললে, 'বড্ড জ্বর দাদাঠাকুর, তিনদিন খাইনি, দুটো ভাত খাবো।' গঙ্গাচরণ তাকে উঠে আসতে বললো, কিন্তু মতি উঠতে পারলো না। গঙ্গাচরণ বাড়ি এসে অনঙ্গকে বললো মতিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতে। অনঙ্গ হাবুকে দিয়ে কিছু কচুবাটা সিদ্ধ পাঠিয়ে দিল। কিন্তু মতি তখন বিকারগ্রস্ত। সে আপন মনে বলছে—

'শালিক পাখি শালিক পাখি, ধানের জাওলায় বাস—

... ...

বিলির ধারের পদ্মফুল

নাকের আগায় মোতির ফুল—'

হাবুর ডাক সে শুনতেই পেল না।...

আসলে অনাহার-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু মতি তখন তার বাল্যের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। সে তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলছিল আর ছড়া বলছিল। আমাদের মনে হচ্ছে, সে মৃত্যুযন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তার কোন কষ্ট হচ্ছিল না। সুখ-দুঃখের এক বোধাতীত জগতে তার চেতনা তখন পাড়ি দিচ্ছিল, কিংবা সে শুধু আনন্দই অনুভব করছিল। 'ইছামতী' উপন্যাসের শিপ্টন সাহেবের মৃত্যুর মুহূর্তেও তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার স্বদেশ ওয়েস্টমোরল্যান্ডের অ্যাল্ডসি গ্রামের ছবি। তিনি তখন তাঁর দশ বছরের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে নিজেও একটি বালক হয়ে খরগোশ শিকার করতে চলেছিলেন। নরপশু দেওয়ান রাজারামও সড়কির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রক্তস্নাত হয়ে দেখছিলেন ইছামতীর কূলে তিলুর খোকাটা কেমন সুন্দর হাসছে!

আসলে মানুষকে যারা কিছুমাত্র ভালবাসে, পরম পিতা ঈশ্বর যেন তাদের পাপতাপের সমস্ত গ্লানি অসীম ক্ষমায় ধুয়ে দিয়ে তাদের অন্তিম মুহূর্তটি আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করে দেন। নীচ জাত মুচির মেয়ে মতি-মুচিনী পাঠকের মানসস্বর্গে চিরকাল বেঁচে রইলো! এখানেই মানবদরদী বিভূতিভূষণের শিল্পী হিসেবে বড় কৃতিত্ব।